মাধ্যমিক শিক্ষা

শিক্ষাক্রম সংস্কারে গবেষণার বিকল্প নেই

শিক্ষা সংস্কারে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা পরিবর্তন করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা জরুরি

মো. আশরাফুজ্জামান

প্রকাশ: ০৫ মে ২০২৬ | ১৫:৪৬

- অ +

শিক্ষা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন, মানবসম্পদ গঠন এবং সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাই শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত গবেষণা, অংশীজনদের মতামত এবং বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় সাম্প্রতিক শিক্ষাক্রম সংস্কারের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে এই মৌলিক নীতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক সবার ওপরই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের উপর, যাদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষাক্রমের অধীনে পাঠগ্রহণ করতে হয়েছে।

২০২১ সালে সরকার ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ২০২১ প্রণয়ন করে এবং এর আলোকে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। এই নতুন কাঠামোর মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষাকে আরও দক্ষতাভিত্তিক, জীবনমুখী এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে ২০২৩ সাল থেকে ধাপে ধাপে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন শুরু হয় এবং ২০২৪ সালের মধ্যে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত নতুন বই ও শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য নতুন ধরনের মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়, যেখানে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, কার্যভিত্তিক শেখা এবং প্রকল্পভিত্তিক কাজের ওপর জোর দেওয়া হয়।

নীতিগতভাবে এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ইতিবাচক ছিল। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক ঘাটতি দেখা দেয়। প্রথমত, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব ছিল। নতুন শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য যে ধরনের দক্ষতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন, তার অনেকটাই শিক্ষকরা পাননি। ফলে শ্রেণিকক্ষে নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, অভিভাবকদের মধ্যে নতুন মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রচলিত নম্বরভিত্তিক মূল্যায়নের পরিবর্তে বর্ণনামূলক মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ধারণা অনেক অভিভাবকের কাছে স্পষ্ট ছিল না। যথাযথ প্রচারণা ও জনসচেতনতা তৈরি না হওয়ায় এই মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অনেক অভিভাবক মনে করেন যে, এতে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্জন নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

তৃতীয়ত, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের আগে পর্যাপ্ত গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অভাব ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। কোনো শিক্ষাক্রম পরিবর্তন সাধারণত পাইলট প্রকল্প বা সীমিত পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে শুরু করা হয়, যাতে বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এখানে দ্রুতগতিতে পুরো দেশে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা হয়, যার ফলে বাস্তবায়নের সময় অনেক অপ্রত্যাশিত সমস্যা সামনে আসে।

ফলে শিক্ষাক্রম নিয়ে দেশে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। জনমত, অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং বিভিন্ন মহলের সমালোচনার প্রেক্ষিতে সরকার অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় যে ২০২৫ সাল থেকে নতুন শিক্ষাক্রম বাতিল করে আবার ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমে ফিরে যাওয়া হবে। সেই অনুযায়ী পুরোনো পাঠ্যপুস্তক সংশোধন করে আবার স্কুলে সরবরাহ করা শুরু হয়।

কিন্তু এখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে, পর্যাপ্ত গবেষণা ছাড়া হঠাৎ করে আবার পুরোনো শিক্ষাক্রমে ফিরে যাওয়া কতটা যৌক্তিক? ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অবশ্যই এক সময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদাও বদলেছে। প্রযুক্তি, কর্মসংস্থান, বৈশ্বিক দক্ষতা এবং সামাজিক বাস্তবতার পরিবর্তনের কারণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন রয়েছে। তাই কেবল পুরোনো কাঠামোতে ফিরে যাওয়াই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান নয়।

বরং এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল সুপরিকল্পিত গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের। একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, গবেষক, অভিভাবক ও অন্যান্য অংশীজনদের মতামত নিয়ে একটি নতুন ও বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতি ও তার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা যেতে পারত। সেই শিক্ষাক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে, ফলাফল মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার পর ধাপে ধাপে তা সারাদেশে বাস্তবায়ন করা আরও যুক্তিসংগত হতো।

উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে, পর্যাপ্ত গবেষণার মাধ্যমে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২০২৭ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে উচ্চ শ্রেণিগুলোতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু করা যেতো। এতে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া, পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন করা এবং অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পাওয়া যেতো।

ভবিষ্যতের শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। এর মধ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স, যোগাযোগ দক্ষতা, কর্মমুখী শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা,

নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশ এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তির বিকাশ। বর্তমান বিশ্বে কেবল তথ্য মুখস্থ করার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যকর হয় না, বরং শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান, উদ্ভাবন এবং সহযোগিতামূলক কাজের দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। তাই শিক্ষাক্রমকে এই বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষা সংস্কারে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা পরিবর্তন করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা। একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও ধারাবাহিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ঘন ঘন পরিবর্তন শিক্ষার্থীদের শেখার ধারাবাহিকতা নষ্ট করে এবং পুরো ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা তৈরি করে।

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় ভবিষ্যৎ সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন গবেষণাভিত্তিক পরিকল্পনা, ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন এবং সব অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এভাবেই একটি টেকসই, আধুনিক এবং মানবিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

মো. আশরাফুজ্জামান: সহকারী অধ্যাপক, এডুকেশনাল টেকনোলজি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ